দৈনিক জনকণ্ঠ 26
তারিখ: ৮/১১/২০০০
পৃষ্ঠা ১..৭ কলাম ৬....

উপাচার্য নিয়োগ এবং শিক্ষার পরিবেশ

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ

সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতার মসনদে সাধারণত দলীয় সরকারের অবস্থানই দেখা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই দলীয় সরকারের উদ্দেশ্য থাকবে দলের শক্তি বৃদ্ধি করা। এজন্যই সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণের বিষয়টি বরাবর চোখে পড়ে। শুধু আমাদের দেশ নয়, বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশেই এই ধারা প্রচলিত। দলীয়করণ রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সবসময় কুফল বয়ে আনে না, অনেক ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক ফলও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সঙ্কট হয় তখনই যখন দলীয়করণ করা হয় শুধুই দলের স্বার্থচিন্তায় এবং তা করতে গিয়ে স্বাভাবিক অগ্রগতি ও উৎকর্ষের ধারাকে ব্যাহত করে। ক্ষেত্রবিশেষে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। এ রকম একটি ক্ষেত্র হিসাবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবছি।

অনেকদিন থেকেই এ দেশের সচেতন মানুষ যে ভাবনায় আচ্ছন্ন ছিল, দলীয়করণের কুপ্রভাবে শঙ্কিত হচ্ছিল, তা এখন ক্রমে সকলের সামনে দৃশ্যমান হচ্ছে। গত ২৭ অক্টোবর জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে রয়েছে এরই এক প্রামাণ্য ছবি। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে সরকারী দলের ভিতর থেকে যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছে তার স্বচ্ছ চিত্র রয়েছে রিপোর্টটিতে। সরকারদলীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়ার কথা রিপোর্টটিতে যেভাবে এসেছে তাতে অন্তত দুটো দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্ট করা যায়।

এক. ভিসি পদে যাঁকে নিয়োগ দেয়া হবে তাঁকে দলের প্রতি ষোলোআনা আনুগত্য দেখাতে হবে এবং কোন পর্যায়ে বিতর্কিত চিন্তা করেছেন এমন রেকর্ড থাকা চলবে না।

দুই. দলের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই এমন কোন পণ্ডিতকে ভিসি করা যাবে না। অর্থাৎ প্রকাশিত প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, পাণ্ডিত্য ও মেধায় সর্বজনমান্য হলেও দলীয় আনুগত্যের সার্টিফিকেট না থাকলে ভিসি পদে নিয়োগ লাভ প্রশ্নাতীত। অবশ্য সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসিদের একজনের কোন শিক্ষাগত সার্টিফিকেটে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণী থাকার কথাও প্রতিক্রিয়াকারীরা উল্লেখ করতে ছাড়েননি। প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পূর্বাপর ভঙ্গি দেখলে বোঝা যাবে ক্ষুব্ধ পক্ষের যুক্তিকে বলিষ্ঠ করতেই শুধু মেধা ঘাটতির প্রশ্নটি এসেছে।

যেকোন আইন, অধ্যাদেশের ভিতর ভাল বা কল্যাণ চিন্তার পাশাপাশি আইনের ফাঁক বা অমঙ্গলের ক্ষত লুকিয়ে থাকে। অসাধু ক্ষমতাধররা সেসব, ক্ষত আবিষ্কার করে তাতে লাভের ও লোভের পসরা সাজায়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল। এই অধ্যাদেশের ভিতরেই রয়েছে ভিসি নিয়োগের 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতি। সিনেটরদের ভোটে উপাচার্য পদপ্রার্থী তিন জন নির্বাচিত হন। এঁদের ভিতর থেকে পছন্দ মতো যে কোন একজনকে চ্যান্সেলর উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দান করেন। আপাতদৃষ্টিতে এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হলেও এর ভিতরকার ফাঁক খুঁজে নিয়ে দলীয়সরকারগুলো দলীয় উপাচার্য নিয়োগের পথ পাকাপোক্ত করে নেয়। এর জন্য কায়দা করা আছে শুরু থেকে। কায়দাটি করা হয়েছে সিনেটর নিয়োগ ও নির্বাচনের পদ্ধতির ভিতরেই। সিনেটরদের একটি অংশ রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ভিতর থেকে এবং অপর অংশ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন করা হয়। এই উভয় পক্ষের ভিতরেই কিছুসংখ্যক সিনেটর থাকেন যাঁদের কোন না কোনভাবে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে দলীয় সিদ্ধান্তের প্রতি একটি দায়বদ্ধতা কাজ করে। সিনেটরদের বাকি অংশ চ্যান্সেলর সরাসরি নিয়োগ করেন। এঁদের বাছাই করা হয় এমপি আর আমলাদের ভিতর থেকে। নিয়োগকর্তা হিসাবে চ্যান্সেলরের নাম ব্যবহৃত হলেও এ ক্ষেত্রে অঙ্গুলি হেলন থাকে দলীয় সরকারপ্রধানের। এসব ক্ষেত্রে নিয়োগ লাভকারী উল্লিখিত সিনেটরগণ উপাচার্যের প্যানেলে সাধারণত সরকারী প্রেসক্রিপশন অনুযায়ীই ভোট প্রদান করে থাকেন। অন্য সিনেটরদের ভোটে পক্ষ-বিপক্ষের টানাপোড়েনে ভারসাম্য তৈরি করলেও উল্লিখিত 'সরকারী ভোট'গুলো সাধারণত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করে। এভাবে তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উপাচার্য প্যানেলে ভোটাভুটি হলেও প্রায়শই সরকারী দলের আশীর্বাদপুষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীই নির্বাচিত হন। কখনও কখনও জনপ্রিয়তা, ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের বিচারে তিনজনের একজন সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হলেও দলীয় পরিচিতি ও আনুগত্য না থাকায় তিনি চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োগ লাভে ব্যর্থ হন। আবার সরকারদলীয় একাধিক উপাচার্য পদপ্রার্থী নির্বাচিত হলে তাঁদের ছোটোছুটি শুরু হয়ে যায় সরকারের বিভিন্ন মহলে। এ সময় মন্ত্রী থেকে ছাত্রনেতা পর্যন্ত সকলেই জড়িত হয়ে পড়েন যার যার কাছের মানুষের পদ লাভকে নিশ্চিত করতে। ফলে দলীয় পরিমণ্ডলে অনুরাগ-বিরাগ দুই-ই বাড়তে থাকে।

উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রটি এভাবে দলীয়করণ ও রাজনীতিকরণ হওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ও শিক্ষার পরিবেশ নানা ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ছাত্ররাজনীতিতে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির আধিপত্যের কারণে যেমন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মেধাবী ছাত্ররা রাজনীতির প্রতি উৎসাহ হারিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে তেমনি মেধা বিচারের বদলে পক্ষপাত দুষ্ট দলীয়করণের কারণে পাণ্ডিত্য ও মেধায় উজ্জ্বল অনেকেই উপাচার্য পদটির প্রতি আর এখন আকর্ষণ বোধ করছেন না। আর করলেও দলীয় পরিচিতি এবং কর্তাভজনের গুণ না থাকায় তাঁরা নির্বাচকদের তালিকা থেকে বাদ পড়ছেন।

এই বাস্তবতার কারণে উপাচার্য পদটির প্রতি যাঁরা তীব্র আকর্ষণবোধ করেন তাঁরা ক্রমাগত নিজেদের বলয় তৈরি করতে থাকেন। ফলে শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা পেল কি পেল না তা নিয়ে তাঁরা খুব বেশি চিন্তিত থাকেন না। ভাল ও দায়িত্বশীল শিক্ষক হওয়ার বদলে এ শ্রেণীর শিক্ষকগণকে অহর্নিশ ব্যস্ত থাকতে হয় সরকার ও সরকারী দলের উর্ধতন মহলের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। পাণ্ডিত্য প্রকাশের বদলে বর্তমানে উপাচার্য হওয়ার প্রকৃত পথ আনুগত্য প্রকাশের বিনিময়ে তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। সার্টিফিকেটে তৃতীয় শ্রেণী থাকার পরও কেউ কেউ উপাচার্য পদে নিয়োগ পাচ্ছেন। জানি না এমন অভিযোগ কতদূর সত্য। সত্য না হলেই আমরা স্বস্তি পাব।

কিন্তু কঠিন বাস্তব হচ্ছে এই যে, দলীয়করণের কুটিল উদ্দেশ্য নিয়ে এবং যুক্তিবুদ্ধি ও মেধার প্রসঙ্গ এড়িয়ে বর্তমানে উপাচার্য নিয়োগের প্রবণতা বাড়ছে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলর সরাসরি নিয়োগ দিতে পারছেন সেখানে তো স্বেচ্ছাতন্ত্র কাজ করছেই– আবার যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাভুটির ব্যবস্থা আছে সেখানে স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রকাশের জন্য তো বিশেষ কৌশলই রয়েছে, যে বিষয়ে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। যাই হোক, এসব বাস্তবতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশকে দারুণভাবে নষ্ট করছে। যাঁরা ঘাম ঝরিয়ে, কৃপা ভিক্ষা করে উপাচার্য হচ্ছেন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনায় আত্মবিশ্বাস কম থাকার কথা। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে দলীয় তথা সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব তাঁদের নিতে হচ্ছে। কারণ আমাদের দেশে সরকারী-বিরোধী সকল শিবিরের রাজনীতি বণিকদের ধারণা ক্ষমতার একটি বড় উৎস ক্যাম্পাস করায়ত্ত রাখা। এসব কারণে এ ধারার উপাচার্যগণ সচেষ্ট থাকেন সিনেট, সিন্ডিকেট থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে যেন অনুগত এবং অভিন্ন মতের শিক্ষকগণ বহাল থাকেন। তাই দলভারি করার জন্য তাঁরা প্রশাসনিক শক্তি ও সুবিধাগুলো ব্যবহার করতে থাকেন। এভাবে কলুষিত হতে থাকে শিক্ষক রাজনীতি। বিভাগগুলোতে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের বদলে প্রায়শই 'ভোটার শিক্ষক' নিয়োগ হতে থাকে। আজকাল মাঝেমধ্যেই পত্রিকায় এ জাতীয় নিয়োগের অনুসন্ধানী রিপোর্ট চোখে পড়ে। এসব চিন্তা ও ঘটনা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যকর নয়। ভাল শিক্ষকের যথার্থ মূল্যায়ন না হওয়ায় একদিকে তাঁরা যেমন হতাশাগ্রস্ত হচ্ছেন অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মেধার শিক্ষকের অবস্থান বাড়তে থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছে। এ সবের বিরূপ প্রতিক্রিয়া শিক্ষার পরিবেশকে স্বাভাবিক ভাবেই করছে বিঘ্নিত।

আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রকগণ যদি একবার অনুভব করতে চাইতেন তাঁদের দলীয় সঙ্কীর্ণ উচ্চাভিলাষ কিভাবে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে তবে স্বস্তি পেত সাধারণ সচেতন মানুষ। অন্ধকারকে লালন করে জাতির ভবিষ্যত নির্মাণ করা সম্ভব নয়। এই বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সকল স্তরের মানুষকে এখনই সরব হতে হবে।